Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 278 - 288
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ’র ছোটগল্প : ভাবনা ও প্রকাশের সাযুজ্য সন্ধান

মিজানুর রহমান
গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID : persianmizan@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Tagore, Jamalzadeh, Short story, Culture, Norm, Construction, Narrative.

Abstract
The short stories of Tagore and Jamalzadeh are the best sources of short stories in Bengali and Persian languages. It is from their hands that this element has got its start and stability. They have made various experiments in the texture of the story and made its acceptance sky high among the readers. Short stories are called fiction because they are written on the words of ordinary people. Here the characters are speaking. The issues of the parliament and from the society are also discussed in the story. Tagore in his stories wrote about childishness, history, horror, love, memory, position of women, nature, science etc. Similarly, Jamalzadeh, the son of Persian civilization, brought out politics, language, society, religion and culture in his story. Their storytelling and artistry are almost close. However, Jamalzadeh has shown a lot of skill in writing political issues as stories. Both the stories are superior in terms of story language, composition, plotting, narrative construction etc. The well accepted aspects are presented in this article.

Discussion

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ’র ছোটগল্প বাংলা ও ফারসি ভাষার ও সাহিত্যের সর্বাধিক পঠিত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। উভয়েই মেধা, মনন এবং কল্পনাকে এমনভাবে কাজে লাগিয়ে গল্প লিখেছেন যা পাঠকের কাছে এক অনন্য আবেদন নিয়ে বারংবার হাজির হয়। ছোটগল্পের জমিনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে এক পোক্ত ভীত দিয়ে গেছেন। যার ফলে এমাধ্যমটি এখন সবার কাছে আদরণীয়। অলিগলি থেকে সংসদ ভবনের আলোচ্য বিষয় গল্প হয়ে ওঠে উভয়ের কাছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে শিশুতোষ, ইতিহাস, ভৌতিক, প্রেম, স্মৃতি, নারীর অবস্থান, প্রকৃতি, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে আশ্রয় করে লিখেছেন। তেমনি পারস্যের সন্তান জামালযাদেহ তাঁর গল্পে রাজনীতি, ভাষা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি তুলে এনেছেন। প্রায় কাছাকাছি তাদের গল্পের ভাব, শিল্পগুণ এবং প্রকাশরীতি।

গবেষণা পদ্ধতি ও যৌক্তিকতা : এটি যেহেতু একটি তুলনামূলক বা সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য অন্বেষা পদ্ধতির গবেষণা সেহেতু উভয় গল্পকারের গল্পকে বিষয় ও শৈল্পিক মূল্যমানে পাশাপাশি রেখে সাযুজ্য বা ঐক্যের স্থানগুলির আলোচনা স্থান পাবে। বাংলাদেশে বা ভারতের বাংলা ভাষাভাষী গবেষকদের মধ্যে কেউই উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণা করেননি। ফলে এজনরায় গবেষণা প্রবন্ধটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গবেষকদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এখানে উভয়ের মূল গল্পগ্রন্থ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বোদ্ধা সমালোচকগণের মতামতকে টেনে আনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ'র ছোটগল্প বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁদের হাত ধরেই তো এ উপাদানটির প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব লাভ করেছে। তাঁরা গল্পের জমিনে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে পাঠকসমাজে এটির গ্রহণযোগ্যতাকে আকাশচুম্বী করে তুলেছেন। বিষয়বৈশিষ্ট্য, ভাবনার জগত এবং প্রকাশভঙ্গিতে তাঁদের গল্প অনন্য। সেই অনন্য দিকগুলি এপ্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, আঁকিয়ে, ভ্রমণগদ্য রচয়িতা, দার্শনিক, কণ্ঠশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ৭ মে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (রহমান, ২০১২: ১৭) উপর্যুক্ত মাধ্যমগুলোতে ছোট-বড় প্রায় ২৩৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এত এত সৃজনসম্ভারের মধ্যেও তিনি বিশ্বকবি নামে সুখ্যাত। কেননা, তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ ঝড়হম ঙভভবৎরহমং এর জন্য তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নোবেল জয় করেন। (রফিক, ২০২০: ৩৮) তাই বলে ছোটগল্পকার বা ঔপন্যাসিক হিসেবে কিন্তু কম পরিচিত নন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ছোটগল্প ভিখারিনী (১৮৭৭) লিখে বাংলা ছোটগল্পের জনক খ্যাতি লাভ করেন।(মাওলা, ২০১৯: ৫৭) আর তাঁর হাত ধরেই এ শাখাটি উৎকর্ষ লাভ করে। ১১৯টি ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌতিক, যৌতুক প্রথা, প্রেম-বিরহ, শৈশবের নানা দিক ইত্যাদি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। কাব্যিক আর ঔপন্যাসিক ধারার বাইরে এসে মানুষের জীবনকে ছোটগল্পের অবয়বে তুলে ধরাতে রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলা ভার। গল্পগুচ্ছে যে গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন প্রথমে তাঁর ছোটগল্প (১৩০০ বঙ্গাব্দ), বিচিত্র গল্প (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ), কথা-চতুষ্টয় (১৩০১ বঙ্গাব্দ), গল্প-দশক (১৩০২ বঙ্গাব্দ), গল্প (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), কর্মফল (১৩১০ বঙ্গাব্দ), আটটি গল্প (১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ), গল্প চারটি (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ), গল্পসপ্তক (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), পয়লা নম্বর (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), তিনসঙ্গী (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। (হায়দার, ২০১১: ১৪) আবার গল্পগুচ্ছের বাইরেও রয়েছে তাঁর বেশ কিছু গল্প। এগুলো রয়েছে তাঁর লিপিকা (১৯২২), সে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) ও গল্পসল্প (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) পুস্তকে। তিনি আশি বছর বয়সে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের একজন বহুমাত্রিক প্রোজ্জ্বল লিখিয়ে। লেখকের নিজ ভাষ্যমতে নেসফে জাহান বা অর্ধ-পৃথিবী খ্যাত সমৃদ্ধ নগরী ইস্ফাহানে ১৩ জানুয়ারি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (হাকিমি, ২০১৯: ১৮২) ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবারের এ সুসন্তান মাত্র বারো বছর ইরানে থেকে লেবানন, জার্মানি, ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডে পাঠাধ্যয়ন শেষে জেনেভায় স্থায়ী হন। ২৩০টি গ্রন্থের গ্রন্থকার জামালযাদেহ ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনি, গবেষণা, ইতিহাস ইত্যাদি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যের সাহিত্যকর্মের জন্য ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে নোবেলের জন্য মনোনয়ন তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন।(হাসেমি, ২০০৮: ১০) কিন্তু রাজনৈতিক বিবেচনায় তা বাস্তবে রূপলাভ করেনি। ইরানে 'সবথেকে পরিশ্রমী' লেখক হিসেবে পরিচিত জামালযাদেহ তাঁর প্রাচীন যুগের সাহিত্যের সাথে আধুনিক যুগের মেলবন্ধনের গদ্যসাহিত্যের একজন অত্যুজ্জ্বল লেখক। কিন্তু এসব অভিধা ছাড়িয়ে তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ফারসি শেকার আস্ত বা ফারসিই চিনি নামক গল্প লিখে ফারসি ছোটগল্পের জনক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দ্বারাই এ রীতিটি পোক্ততা লাভ করে। মাত্র বারো বছরের ইরানের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে তিনি প্রায় সত্তরটি ছোটগল্প রচনা করে ইরানের সমাজ-সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ইত্যাদির সুনিপুণ বুনন করেছেন। তাঁর কয়েকটি গল্পগ্রন্থের নাম হচ্ছে, ইয়াকি বূদ ইয়াকি নাবূদ বা একদা একসময় (১৯২১) সার গুযাস্তে আমুয়ে আমুয়ে হোসাইল আলী বা হোসাইন আলী চাচার গল্প (১৯৪২), সার ভা তাহে ইয়েক কারবাস বা এক তাবুর কাপড়ের আগাগোড়া (১৯৫৫), তালখ ভা শীরীন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বা তেতো ও মিষ্টি (১৯৫৫), শাহকর বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম (১৯৫৮), গাইর আজ খোদা হিচ কেচ নাবূদ বা খোদা ছাড়া কেউ ছিল না(১৯৬১), অসেমান ভা রেসমান বা আকাশ ও দড়ি (১৯৬৪), কেচ্ছেহয়ে কুতা'হ বার'য়ে বাচ্চেহ'য়ে রিশদ'র বা দাঁড়িওয়ালা বাচ্চাদের জন্য ছোট্টগল্প (১৯৭৪) ইত্যাদি। প্রখ্যাত এ লেখক ১০৫ বছর বয়সে ৮ নভেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেনেভায় ইন্তেকাল করেন।(তাক্বিযাদে, ১৯৫৪: ২৫৮)

সবাই সমকাল শাসিত। সময়ের সন্তানও। আর লেখকদের বেলায়তো এটা সর্বাগ্রে। কেননা, তাকে টিকিয়ে রাখে বা বাঁচিয়ে রাখে তার লেখা। আর লেখায় পাঠক সমকালকে খুঁজে না পায়, নিজের ভাষা ও কথাকে খুঁজে না পায় তাহলে লেখককে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে। যেমন পৃথিবীর আদিকাল থেকে অনেক লেখকই লিখে গেছেন। কিন্তু টিকে আছেন ক'জন? তারাই টিকেছেন যারা নিজ সময়কে ধারণ করে এমন কিছু বলেছেন বা বুনেছেন যা সবসময় প্রাসঙ্গিক। কেননা, লেখকগণ সবসময় প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী হন। এমনই প্রাগ্রসর চিন্তার মানুষ উভয় লেখকই। এখানে অবশ্যই সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ প্রাতিস্বিকতার পরিচয়ে ভাস্বর। কেননা, তাঁর লেখক সত্তাই জন্ম হয়েছে মাশরুতিয়াত বা সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। বাবাকে হারিয়েছেন সমকালীন স্বৈরাচারীর হাতে। তাই তিনি জনগণের চাওয়াকে, জনমণের ভাষাকে রূপ দিয়েছেন তাঁর গল্পের প্লটে, আখ্যানে ও আবহে। ফারসি শেকার আস্ত'র ঘটনা এই ডামাডোল নিয়ে। আর সমকালীন রাজনীতিকদের চরিত্রকে তিনি সুক্ষ্মভাবে এঁকেছেন রাজুলে সিয়াসি (رجل سیاسی) নামক গল্পে। তিনি সেখানে দুজন ধান্দাবাজ রাজনীতিবিদের কথোপকথনে লিখছেন -

> "বললেন, না, না, সততার সাথে এসবের কি সম্পর্ক? সততা মমানে ঘুষ ঘুষ গ্রহণ না করা। রাজনীতিক সেই যে ঘুষ নেয় না। বললাম ঘুষ দ্বারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন? ওই মোল্লাদের এবং ধর্ম ব্যাখ্যাকারদেরকে যেমন দেয়? বললেন, হ্যাঁ আগের দিনে ফকির-ফোকরারা বুজুর্গদের, সম্ভ্রান্তদের, শেখ এবং মোল্লাদের ঘুষ দিতো। কিন্তু সংবিধান আন্দোলন যখন থেকে হল তখন থেকেই কাজটা উল্টা হয়ে গেছে। এখন অভিযাতরা, উজির-হাকিমরা অধীনস্থদের ঘুষ দেন। বললাম, তাইলে এটা তো ঘুষ হচ্ছে না এটা যাকাত-ছদকার মতো। এতে দোষ কী? বললেন, ছদকা তো দেয় আল্লাহর রাস্তায়। কিন্তু ঘুষ হলো আগেকার দিনে যেমন কেউ উচ্চপদ পেতে চাইলে শাহ এবং প্রধানমন্ত্রীর পেছনে হাজার তুমান, দুহাজার তুমান বিনিয়োগ করতো এবং তাদের কার্য সাধন হয়ে যেতো। এখন সে উদ্দেশ্যেই সেই রকমই হাজার দু'হাজার তুমানকে পাঁচ তুমান, দশ তুমান হিসেবে ভাগ ভাগ করে ছোট ব্যাগে ভরে ৩০-৪০জন রাজনৈতিক ব্যক্তির দরজায় পৌঁছে দিয়ে যেকোনো উচ্চপদে পৌঁছে যান তারা। এই যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দেখছেন এদের অধিকাংশের রাতদিনের কাজই হচ্ছে এই নিলাম।"[১]

আর দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সসময়কে তীক্ষ্ণভাবে অবলোকন ও উপলব্ধি করেছেন। সেগুলোর যে অভিঘাত তা তাঁর সৃজনে স্পষ্ট। বিশেষ করে ছোটগল্পের জমিনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের যে গল্পগুলো শেষপর্বে লিখেছেন তাতে যে অভিঘাত ও মোড় নিয়েছেন তিনি তা নিজেই এভাবে লিখছেন -

> "My stories of a later period I have got to necessary technique... I have different strata of my life and all my writings can be divided into so many periods. All of us have different incarations in this very life. We are born again and again in this very life."[২]

গল্পকার মানেই পাঠকের মনোরাজ্যকে জয়কারী। ক্রমাগত পাঠককে কথার জাদু, ঘনঘটার আকস্মিকতা আর আখ্যানে মাতিয়ে কল্পরাজ্যে ভাসিয়ে নিজের কব্জায় রাখা। এটি করতে গল্পকারকে হতে হয় অত্যন্ত সচেতন ও মেধাবী। নাহলে ক্লাইমেক্সে উপনীত হওয়ার আগেই পাঠকের মনে বিতৃষ্ণা জেগে পাঠের টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে নেবে। আর বিরক্তি ভাব নিয়ে পুস্তকখানা ছুড়ে দেবে টেবিল বা বিছানার নিচে। ধুলোমাখা হবে গল্পের ডালি। লেখকের আশায় পড়বে গুড়ে বালি। এরকম গুড়ে বালি কিন্তু ঘটেনি বিচক্ষণ ও মেধাবী গল্পকারদের বেলায়। অধিকন্তু পাঠক বারংবার পাঠে আগ্রহী হয়েছে।

পাঠ শেষে ভেবেছে অসংখ্যবার। আমরা ছোটবেলায় রূপকথার গল্পে যে ভূত-প্রেত ইত্যাদি শুনেছি তাতে মনের আঁধারে একটি ভয়ের কোণ নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি খারাপ জিনের আছরে চারপাশে অনেককেই নাস্তানাবুদ হতে দেখি। যার রেখাপাত মননে স্থায়ী। ফলে একাকী আঁধার রাতে বাঁশের ঝাড়ে বা বাগানে গা ছমছম করে ওঠে। মনে পড়ে যায় ভৌতিক গল্পের কোনো ক্লাইমেক্স। আরও ভয় বেড়ে যায়। এমনই আবহে পাঠককে ভীতিকর পরিস্থিতির সামনে ফেলতে জামালযাদেহ নৈপুণ্য দেখাতে সফল হয়েছেন। তিনি দোস্তিয়ে খলেহ খরসে (دوستی خاله خرسه) বা ভালুক খালার বন্ধুত্ব শীর্ষক গল্পে উত্তমপুরুষের বর্ণনায় লিখছেন -

> "আমি আর কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটুকুই শুধু জানি খানিকক্ষণ বাদেই গুলির শব্দ হল এবং খুব দ্রুত থেমে গেল। গুলির শব্দে আশেপাশের কুকুরগুলো অলক্ষুণে মর্মভেদী ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গাছের ডালে ঘুমিয়ে থাকা কাকগুলো হতভম্ব হয়ে ডানা ঝাপটে এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে গেল। আবারও কূপের ভেতরে পাথর পড়ে যাওয়ার শব্দের পরবর্তী নিস্তব্ধতার মতো ভয়ার্ত নিস্তব্ধতা ঘুমমাখা গ্রামটাকে গ্রাস করল।"[৩]

পক্ষান্তরে ঠাকুরমার ঝুলির (১৯০৬) ভূমিকা লেখা আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গল্পের ঈশ্বর। তিনিও পাঠক মানসকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন তাঁর লেখায়। পাঠককে হাসি, রম্য, বেদনা, রোমান্স ইত্যাদির পাশাপাশি ভৌতিক আবহে ভাসিয়েছিলেন। যেহেতু গল্প শোনার আগ্রহ আমাদের ঐতিহ্যের। আর ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রূপকথার গল্প। এরূপ রূপকথার আবহ তিনি দিয়েছেন ক্ষুধিত পাষাণ গল্পে। এখানে গা ছমছম করা এক পরিবেশের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন -

> "অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটি ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া ছিল। জল, স্থল আকাশ সহসায় শিহরিয়া উঠিল; এবং অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃংখলছিন্ন উন্মাদের মতো পথহীন সুদূর বনের ভেতর দিয়া আর্ত চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল।"[৪]

প্রেম শাশ্বত। পবিত্র। এপ্রেমের জন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তাঁর এবাদত বন্দেগীর জন্য অসংখ্য ফেরেশতাতো আছেই। কিন্তু তাদের সাথে মহান রবের প্রেম নেই। এই প্রেমের জন্যই আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আ.) মাটি থেকে তৈরি করে নূরের তৈরি ফেরেশতার উপর সম্মান দিয়েছেন। প্রেম স্রষ্টা-সৃষ্টিতে। পিতা-পুত্রে। আত্নীয়-স্বজন-বান্ধবে। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাতে। আমাদের লিখিয়ে স্বজনগণ যেহেতু মানুষ তাই তাঁরা মানুষের জৈবিক, আত্নিক, সামাজিক ইত্যকার বিষয়কে কেন্দ্র করেই গল্প বুনেছেন, বুনছেন ও বুনবেন। মানুষ যখন স্রষ্টার প্রেমে পড়ে তখন সে হয়ে যায় উন্মাদ। আর কোনও প্রেমিক হৃদয়ে যদি নিটোল ষোড়শীর প্রেম উঁকি দেয় সেও হয়ে ওঠে উন্মাদ। তার কাছে জাত-পাত, কূল-বংশ কোনও কিছুই বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। শিরিকে পাওয়ার জন্য যেমন ফরহাদ উন্মাদ থাকতেন তেমনি উন্মাদ হয়ে পড়ে মানবিক মন। সামাজিক সম্মান-মযার্দা একচুল পরিমাণও টলাতে পারে না। এমনই এক প্রেমিকের সাতকাহন গল্পের ফ্রেমে আবদ্ধ করে নিটোল রূপ দিয়েছেন সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ। মোল্লা কোরবান আলী এলাকার লোকের কাছে বেশ সম্মানিত ধর্মীয় ব্যক্তি। অথচ সে হাজি সাহেবের মেয়ে ষোড়শী গওহর খানমকে প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে যান। ঘটনাক্রমে চাঁদমুখখানি একনজর দেখেই নিজের উপর আর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ হারানো একজন প্রেমিকের যোগ্যতা। নইলে সে প্রেমিক নয়। এইরকম চরিত্র বুননে আন্তরিকতার কোনও কমতি রাখেননি ফারসি ছোটগল্পের জনক। তিনি প্রেমে বিভোর ও দিকভ্রান্ত মোল্লা কোরবান আলীর অবস্থা বর্ণনা করছেন -

> "আমি সামান্য ধাতস্থ হতেই নিজেকে হাজী সাহেবের বাড়ির ছাদের ওপর আবিষ্কার করলাম; একটা ভাঙ্গা টিনের চালার নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পাইপের ফুটো দিয়ে অস্থিরভাবে সে বাড়ির ভিতর দেখিছি। একটা কক্ষের দরজার কাছে শাদা বিছানায় লজ্জায় গুটিশুটি মেরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> এলোমেলো চুলের এক কুমারীর ওপর আমার চোখ আটকে গেল। আমি মৃদুস্বরে সেই কবিতার ছত্রটি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুরু করলাম, যেটা কখনো কখনো মর্সিয়া অনুষ্ঠানে আগত বক্তিদের মনোযোগ বাড়ার জন্য বলতাম -
> 'নিশিদিন আমি তোমার আঁখি দেখি অবাক বিস্ময়ে
> তন্দ্রায় মগ্ন হয়েও জেগে রই তোর প্রেমের জ্বালা লয়ে।' "[৫]

অনুরূপ প্রেমিক হৃদয়ের ছটফটানি ও অস্থিরতার নিপুণ রূপায়ন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর একরাত্রি গল্পে। সুরবালার সে বাল্যপ্রেমিকের সাতকাহন -

> "এমন সময়ে পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতুহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।
> ততক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল-বিশ্বাস সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃদপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবিং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।
> বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি, যাহা করি, কিছুতেই মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা বৃহৎ একটা বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।"[৬]

যদি উভয়ের ছোটগল্পের জগতে প্রবেশ করে শিল্পের নানাদিক অন্বেষণ করি তাহলে বিস্মিত হতে হয় পরিশ্রমী ও মেধাবী লেখকদ্বয়ের গল্পের বৈচিত্র্য দেখে। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাগরিক জীবনে বেড়ে ওঠা ভিন্ন চিন্তার ছোটগল্পের ভুবন। তাঁর প্রথম পর্বের গল্পগুলো গ্রামীণ আবহ কেন্দ্রিক, আর তাতে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের হৃদয়রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য। এ পর্বের গল্পে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণামী ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে প্রকৃতি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, পোস্টমাস্টার, সুভা, অতিথি প্রভৃতি গল্প এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ঠিক একইভাবে শহুরে লেখক জামালযাদেহ তারঁ গল্প ভুবনের প্রথম গল্প ফারসি শেকার আস্ত-এ শহুরে বিষয় আশয় নিয়ে গল্পবুনতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মার পলিদ্বারা বিধৌত এলাকার জনগোষ্ঠীর থেকে নিজ গল্পের ভ্রূণ খুঁজে নিয়েছেন, তেমনি ইস্ফাহানের জায়ান্দে নামক নদীর আশেপাশের মানুষও বাঙময় হয়েছে জামালযাদেহ'র কথ্যরীতির ছোটগল্পে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের নিবিড়-আত্মিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদজনিত জটিলতা গল্পগুচ্ছের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ ঘটলে মানবজীবনে নেমে আসে আত্মিক মৃত্যু। ছুটি, সুভা, সমাপ্তি, অতিথি প্রভৃতি গল্প তার উজ্জ্বল উদাহরণ। দ্বিতীয় ভাগের গল্পগুলোতে তিনি শহরমুখী হয়েছেন। তাতে শহুরে বিষয় আশয় স্থান লাভ করেছে। রোমান্টিক আবহ ছেড়ে কঠিন বাস্তবের দিকে এগিয়ে যায় লেখার বৈতরণি। আর তৃতীয় ভাগের গল্পগুলোতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বের নানা টানাপোড়েন আখ্যান লাভ করেছে। প্রথম দিককার ভাষা কিছুটা ঔপনিবেশিক মোড়কে আচ্ছন্ন। এরপর কাব্যিক সুষমা। চিত্রল, গীতল, উপমা আর বাক্যগঠনে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন।

পারস্য সভ্যতার উত্তরসূরি জামালযাদেহ'র প্রথম দিককার গল্পগুলোর ভাষা সহজ ও সাবলীল। তিনিই এ শাখাটি নিয়ে প্রথম নিরীক্ষা চালিয়েছেন। যার ফলে নানা চড়াই-উৎরাই পেরুতে হয়েছে। তিনি মনে করতেন যে, সাহিত্য বিশেষ করে ছোটগল্প হচ্ছে 'জীবনের দর্পণ'। তাই তার যথার্থ উপলব্ধি নিয়ে জীবনের ভাষায় ছোটগল্পকে মূর্ত করে তুলেছেন। যার জন্য ইরানের কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিক রীতিনীতি এবং জনগণের মুখের ভাষা ব্যবহার করে সাহিত্যকে কাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার সফল প্রচেষ্টা চালান। আমরা তার গল্পের পরতে পরতে লোকজ শব্দাবলী বিশেষ করে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার দেখতে পাই। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের নানাবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি কলমের আঁচড়ে তুলে এনেছেন।

ভাষা সংরক্ষণে উভয়ই প্রশংসিত। তাদের ভাষা চেতনা ছিল উল্লেখ করার মতো। যেখানে যে ধরনের ভাষা, রীতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেরকম ভাষা বা ডিকশন ব্যবহার করে গল্পের ভাষাকে স্রোতস্বিনীর মতো রূপ দিয়েছেন। যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা গল্পে কাবুলীওয়ালা ও মিনির কথোপকথন থেকে জানতে পারি। পক্ষান্তরে জামালযাদেহ'র কেচ্ছেহয়ে কুত'হ বার'য়ে বাচ্চেহয়ে রিশদার'র গল্পগুলো দেখলে ভাষার এই সংরক্ষণ ও স্বতস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হয়।

হাস্যরস বা ব্যাঙ্গাত্মক পরিবেশ তৈরিতে উভয়েই ছিলেন সুনিপুণ কারিগর। জামালযাদেহ তাঁর রাজুলে সিয়াসি বা রাজনীতিক নামক গল্পটিতে একজন ব্যক্তি নিয়ে কী না ব্যাঙ্গাত্মক পরিবেশের তৈরি করেছেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাপক নামক গল্পে যে হিউমার এঁকেছেন তা সত্যই শিল্পসফল ব্যাঙ্গাত্মক রচনা।

সবাই সময় শাসিত। হোক মানুষ, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক বা সৃজনশীল ব্যক্তি। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সময় শাসিত বা সময়েরই ফসল। প্রতাপশালী ব্রিটিশের সময়ে তিনি প্রস্ফুটিত হয়েছেন আপন ঔজ্জ্বল্যে। তবে স্বীয় সময়ে যে তাঁর সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার বিশেষ করে যৌতুক প্রথা ইত্যাদি সেগুলো তাঁকে তাড়িত করে হৈমন্তী'র মতো গল্প লিখে নিয়েছে। পক্ষান্তরে জামালযাদেহ শৈশবে তাঁর পিতাকে স্বৈরাচারী শাসকের হাতে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেছিলেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের যে মাশরুতিয়াত বা সাংবিধানিক আন্দোলন তাই শিল্প-সাহিত্যের সব শাখার বাঁক বদলে একমাত্র নেয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। কবিতা আধুনিক হয়েছে। ছোটগল্পের জন্মভূমি প্রস্তুত করেছে। উপন্যাসের বিষয়াঙ্গিকে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে। নাটক পেয়েছে সঞ্জিবনী। আর তার ফসলই আমাদের জামালযাদেহ। তিনি তাঁর ক্ষরিত খুনকে ছোটগল্পের বাক্যে বাক্যে লেপ্টে দিয়েছেন। এগুলোকে আমরা উত্তরাধিকারও বলতে পারি। আল্লামা আলী আকবার দেহখোদাসহ (১৮৭৯-১৯৫৬) অন্যান্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফারসি ছোটগল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসের ভাষা, ব্যাপ্তি ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে। আর আধুনিকতার জনক মাইকেল মধুসূদনও (১৮২৪-১৮৭৩) পূর্বসুরি। কেননা, তিনিই ইউরোপীয় ধারার কাব্যকলা আত্মস্থ করে বাংলা কবিতাকে আধুনিকতার কাতারে নিয়ে আসেন। এসবই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার রসদ।

দিন বা রাতের নানা সময়ের নান্দনিকতা একজন সৃজনশীল মানুষের মানসকে তাড়িত করে। সকালের স্নিগ্ধতা, পাখির কলকাকলি, শিশিরে স্নাত দূর্বাঘাসের ডগা, অরুণের প্রথম কর কতভাবে না উপস্থিত কাব্যে-গল্পে। ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত দুপুরের নিস্তব্ধতা, ছায়ায় বসে জিড়িয়ে নেয়া চাষি, দুম করে পুকুরের থির জলে দঙ্গল ছেলের লাফিয়ে পড়া যেন জীবন পায় শিল্পীর সৃজনে। গোধুলির মোহিত আভা, দিগন্তের লালিমাতে ডুবন্ত দিনমণি, পেটপুরে খেয়ে নীড়ে ফেরা পাখির দল, হাকিয়ে নেয়া গরু-মহিষের পাল, পাড়ার মসজিদে আজানের ধ্বনি কিংবা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শঙ্খ ধ্বনি আমরা বিমূর্ত হতে দেখি কলমের কালির রেখায়। নিষুতি রাতে ঝিঁঝির ডাক, দূর থেকে ভেসে আসা শিয়ালের হাক, রুগ্নদের খুকখুক কাশি সব সবই গল্পের ভাব আর ভাষা দেয়। শহুরে সকালে নীরবতা, বেলা বাড়লেই ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়া, অফিসমুখী মানুষের ঢল, হকারের ডাক, গাড়িঘোড়ার শব্দ মাতিয়ে রাখে। সন্ধ্যায় ঘর ফিরতি মানুষের ক্লান্ত ঢল, উপচে পড়া যাত্রী নিয়ে যান-কল এগুলিও স্বমহিমায় স্থান পায় সাহিত্যে। এসব কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ শিল্পী হয়ে সুক্ষ্মভাবে তাঁর গল্পের পরতে পরতে বুনে দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছের প্রায় সব গল্পই বারোমাসের ছয় ঋতুর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনে ঋদ্ধ। সুভা গল্পে নিস্তব্ধ দুপুরের যে নান্দনিক উপস্থাপন দেখি তা যেমনি স্বতন্ত্র তেমনি বিরল। শীত প্রধান দেশের জামালযাদেহ তাঁর গল্পে চারটি ঋতুর ব্যতিক্রমী উপস্থাপন করেছেন। সাথে বরফে ঢেকে যাওয়া প্রকৃতির স্পষ্ট ভাষিক ক্যানভাস এঁকেছেন। এক্ষেত্রে উভয় কথাশিল্পীর শৈল্পিক সুর এক মোহনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ বাংলা ও ফারসি ভাষার ছোটগল্পের জনক, এ রীতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা করেছেন, চরিত্রগুলোকে জীবন্ত ও একান্ত পরিচিত করে তুলতে ভিনগ্রহের কাউকে নির্বাচিত না করে আমাদের আশেপাশের কোনো ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে আমাদের ভাষায়ই কথা বলিয়েছেন। সময়ের অভিঘাত, মোড় ইত্যাদিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করেছেন। এগুলিই তাদের ছোটগল্পের মূল সুর। অবয়বেও প্রায় মিল পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের ছোটগল্পে শিল্পরূপ, নান্দনিকতা আর প্রকাশভঙ্গিতে যে সাযুজ্য যে ফুটে উঠেছে তা উপস্থাপিত হচ্ছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। ভাষাই মানুষকে আকৃষ্ট করে। নেয় গহীনে টেনে। লিখিয়ে মানস মানেই তাদের থাকবে এক অন্যরকম ভাষাশৈলী। ভাষার কারিগরি খাটিয়ে সামান্য বিষয়কে কিংবা লোকচক্ষু স্বভাবতই এড়িয়ে এমনকিছুকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলাই ভাষাচিত্রীগণের কাজ। রবীন্দ্রনাথ অনন্য উচ্চতার একজন ভাষাচিত্রী। তাঁর গদ্য আবেগশাসিত, হৃদয়তল-উৎসারিত এবং কবিতাপ্রবণ। গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাতিস্বিকতা এই যে, আজীবন তিনি কবির মতো গদ্য লিখেছেন। আর এ-জন্যই অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঠাকুরের গদ্যকে আখ্যায়িত করেছেন "মহাকবির গদ্য" অভিধায়। পক্ষান্তরে ইরানের সবচেয়ে পরিশ্রমী লেখক ও গবেষক সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী জামালযাদেহ এই ভাষারই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্যই গল্প লেখার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি ঐকান্তিকভাবে চেয়েছেন ভিনদেশি ও ভিনভাষীগণ যেন ফারসি শিখতে পারেন। তাই গদ্যের আশ্রয়ে অলিগলির ভাষা, প্রবাদ বা মিথের ভাষাকে তিনি আগামীর জন্য সঞ্চিত করে রেখেছেন। ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজা হাসেমী এ সম্পর্কে বলেছেন, একজন ভাষাতত্ত্বের গবেষক হিসেবে আমি এই বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ আবশ্যক মনে করছি যে, জামালযাদেহ 'ভাষা চেতনা'র (Language Conciousness) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতেন। ভাষা চেতনার বৈশিষ্ট্য মানে হচ্ছে ভাষা সম্পর্কে সঠিক অবহিতি এবং এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও জাতীয় ঐক্যের কর্মী হওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা।(সবুর, ২০০৮: ০৮)

পাশাপাশি জামালযাদেহ তাঁর গল্পের জমিনে চাষকৃত ফসলরূপী শব্দগুলোর ব্যবহার ও ব্যঞ্জনা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। মুন্সিয়ানার সাথে শব্দ ব্যবহার করে এক দারুণ আবহ ও চেতনা সৃষ্টি করায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অনুরূপ বাংলার কবি ও গদ্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলোতে উভয় চেতনাকেই দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সুনিপুণ সে গদ্যের উদাহরণ হচ্ছে -

> "দেখিল জল খলখল ছলছল ছলছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।" [খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন][৭]

উপমা বা উৎপ্রেক্ষার যে প্রতীতি আমাদের জ্ঞানে সংরক্ষিত তা শুধুই কাব্যিক। এর সাথে কোনোভাবেই যেন গদ্যের কোনও সম্পর্ক আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। এটা আমাদের পাঠক হিসেবে দুর্বলতা। তাই বলে সাহিত্যকলার দারুণ উপাদান যা রচনাকে মনোহরা করে তা থেকে সম্পর্কচ্যুত নয়। কেউ যদি প্রধানত কবি হন তাহলে তাঁর গদ্যে এ অলংকারটি অত্যুজ্জ্বল করে মানকে। ফারসি ও বাংলাভাষার ছোটোগল্পের জনক জামালযাদেহ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ই এ অলংকারটি স্বীয় ছোটগল্পের পরিবেশ পরিস্ফুটনে ব্যবহার করেছেন। এটি তাদের গদ্যের আরেক ধরণের বৈশিষ্ট্য। শ্যামল বাংলাদেশের শ্যামলিমা যাকে আকৃষ্ট করে শহুরে মনকে গল্পের ক্যানভাসে উদ্বেলিত করেছিলো সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুভা গল্পে উপমাময় কথা বুনছেন এভাবে -

> "সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমেই সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোনো একটা পূর্ণিমাতিথিতে কোনো-একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।"[৮]

পক্ষান্তরে বিশ্বকবিতার লালন ও চারণভূমি ইরানের ভূমিপুত্র কাব্যকলায় হাত না পাকালেও কাব্যিক অলংকার উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। গদ্যের প্রসাদগুণ বৃদ্ধির জন্য জামালযাদেহও তাঁর গল্পের সংলাপ-আখ্যানে গদ্যকবির পরিচয় ফোটাতে উপমার ব্যবহার করেছেন। তবে সে উপমা নিজস্ব দেশীয় ভঙ্গির। درد دل ملا قربان علی গল্পে উন্মাদ প্রেমিকের ঘুমহীন ছটফটানি সে রাতের বর্ণনায় লিখছেন -

> "প্রতিবেশী সবাই ঘুমে ডুবে ছিল। কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। চারপাশ থৈথৈ জোসনায় ভরা। দেয়াল আর ছাদগুলো যেন রূপার তৈরি, একদম দুধের মতো শাদা দেখাচ্ছিল। দূর থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> মসজিদে শাহর গম্বুজটাকে বড় একটা ডিমের মতো লাগছিল, মিনার দুটোকে লাগছিল দুটি আঙ্গুলের মতো, যেন সেই দুই আঙ্গুলের ফাঁকে ডিমটাকে ধরে রেখেছে।"[৯]

গল্পকারগণকে চরিত্র রূপায়নে হতে হয় দক্ষ শিল্পীর মতো। কিংবা স্বর্ণকারের মতো। ঝলকে দেখা ঘটনা, পলকে দেখা মানুষ, লহমায় ধারণ করা আবহের সম্মিলন করে অত্যন্ত মমতা দিয়ে বুনতে হয় গল্পের পাত্রপাত্রী বা কুশিলবদের। তাতে পাঠক নিজেকে বা তার পরিচিত কাউকে খুঁজে পান গল্পের চরিত্রে। চরিত্র হাসে, কাঁদে, বিদ্রোহ করে কিংবা প্রেমের যে মূর্তি হয় তাতে মানব মনে দাগ কেটে যায়। মুছে না যা তার থেকে ভালো কোনও চরিত্রের সাথে পরিচয় ঘটার আগ পর্যন্ত। ঐতিহ্যের লালনকারী ও ধারণকারী ইস্ফাহানের ভূমিপুত্র জামালযাদেহ ইরানের অভ্যন্তরীণ মানুষদের দিয়ে যে কথা বলে নিয়েছেন, যে আচরণ উপস্থাপন করে দিয়েছেন তাতে সে চরিত্রগুলো সত্যিই পাঠক মনে দাগ কেটে যায়। যেমন মোল্লা কোরবান আলী, ভালুক খালার বন্ধুত্ব গল্পের হাবিবুল্লাহ ও নিষ্ঠুর-লোভী কাজাক সৈন্য, ফারসিই চিনি গল্পের শায়খ, ভিলানুদ্দৌলা গল্পের নাম চরিত্র, যেমন ডেগচি তেমন বিট গল্পের হাম্মামখানার সেই মর্দনকারী আমাদের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে। এটা গল্পকারের সার্থকতা। অনুরূপ আমাদের বাংলার আলো-বাতাসের লালনকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৈমন্তি, ফটিক, সুভা, সুরবালা, কাবুলিওয়ালা ইত্যাদির যে পোট্রের্ট করেছেন তা পাথরে খোদাই করার মতো। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তারা অনায়াসেই এসকল চরিত্রের নাম বলতে পারেন। তার মানে চরিত্র রূপায়নে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পরম মমতায় বুনতেন চরিত্রগুলো। যেমন সুভা গল্পে তিনি বলছেন -

> "সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল-এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।
> কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জমা করার মতো; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময় ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে তর্জমা করিতে হয় না-মন আপনি তাহার উপর ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখনো প্রসারিত, কখনো মুদিত হয়; কখনো উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখনো ম্লানভাবে মিলিয়া আসে, কখনো অস্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখনো চঞ্চল বিদ্যুতের মতো দিকবিদিকে ঠিকরিয়া উঠে।"[১০]

অনুরূপ আমাদের একসময়কার প্রশাসনিক ভাষা ফারসির মিছ্রিখণ্ডের গল্পকার জামালযাদেহ তার কলমের কালিতে অঙ্কিত গল্পের চরিত্রগুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন। ফারসি শেকার আস্ত বা ফারসিই চিনি গল্পে শায়খের টিপিক চরিত্র রুপায়নে মুন্সিয়ানা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সেই মুন্সিয়ানার নজরানা হচ্ছে -

> "কিন্তু এরই মধ্যে জেলখানার কোন এক কোন থেকে আসা একটা হুইসেল আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়ে তা বলা থেকে আমাকে বিরত করল। ওই কোনায় এমন একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল প্রথমে যাকে আমি ময়লার স্তুপে শিকারের অপেক্ষায় কুণ্ডুলী পাঠিয়ে বসে থাকা একটা শাদা বিড়াল মনে করেছিলাম। কিন্তু না দেখা গেল তিনি এক শায়খ, যিনি মাদ্রাসার অভ্যাস মতো বগলের নিচে দু'হাঁটু দিয়ে দু'পায়ের ওপর বসা আর আবা দিয়ে কান পর্যন্ত ঢাকা। আর চকচকে সাদা বিড়ালটা হচ্ছে তার পরিপাটি পাগড়ীটা তার কানের লতি পর্যন্ত ঝুলানো পাগড়ির প্রান্তটাই একটা বিড়ালের লেজের আকৃতি সৃষ্টি করেছিল। আর ওই হুইসেলটা আসলে ছিল তার ফিসফিস করে দরুদ পড়ার শব্দ।"[১১]

প্রকৃতি আমাদের চারণভূমি। এখানেই হেসেখেলে বেড়াই। এর ফল, জল, ফসলে বেঁচে থাকি। ছায়ানীড়ের আশ্রয়ে পাই প্রশান্তি। ঝরঝর বৃষ্টির মূর্ছনায় মেতে উঠি। কুয়াশায় চাদর মুড়িয়ে চলি। পূর্ণিমার সোমের সাথে কথা বলি। বিহানকালের স্বচ্ছ শিশির কণা, আমাদের করে তোলে আনমনা। নদীর কলতান কিংবা বসন্তে কুহুতান, ঝাঁক বেধে অতিথি পাখি কিংবা

খাবার দিয়ে হাঁসকে ডাকি। সন্ধ্যা পরের লালিমা রেখা, মধু মাসে রসালো ফলের দেখা, ভোররাতে ফোঁটা শিউলি ফুল, সফেদ কাশফুলে ছাপানো শরতের নদীর দুকূল। সবই আমাদেরকে আনন্দ দেয়। উদ্বেলিত করে। কষ্ট মুছে দিয়ে আনন্দে বাঁচতে শেখায়। আর লিখিয়ে যারা তাদেরকে খাতা কলম নিয়ে নান্দনিক অনেক কথা বুনতে বলে। সাহিত্যের প্রধানতম উপাদান হয়েছে এখন প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ। অথচ এই সাহিত্যের খোলস ছিল আগে রাজা-বাদশাহগণের স্তুতিতে ফেনিল। সেই ফেনিল থেকে জীবনঘনিষ্ঠ রূপে আজ রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্য। কথাসাহিত্য তো অলিগলির সাধারণ মানুষের বিষয়ে ঠাসা। ঠাসা আরও প্রকৃতি ও নিসর্গের দারুণ রসে।

জামালযাদেহ একজন জীবনঘনিষ্ঠ ও আধুনিক মানসিকতার গল্পলেখক। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই প্রকৃতি হেসে উঠেছে। নিসর্গের দারুণ উপস্থাপনা গল্পকে করেছো আরও প্রাণবন্ত। এমনই প্রাণবন্ত নৈসর্গিক বুনন পাই তাঁর দোস্তিয়ে খলে খরসেহ নামক গল্পে। তিনি ফারসাঙ্গের বরফ পড়া ও সেসময়কার আশপাশের বর্ণনায় লিখছেন -

> "বরফও থামছিল না; তার দানাগুলো অনবরত ভারী হচ্ছিল। প্রথমে মশার মতো, তারপর মাছির আকারের আর তারপরে ভিমরুলের চেয়ে বড় হচ্ছিল, আর লাখ লাখ শাদা প্রজাপতির আকৃতি সৃষ্টি করছিল, যেগুলো নির্জীব ও ভারী হয়ে উপরের প্রেম-ভালোবাসার বাগান থেকে মাটিতে বর্ষিত হচ্ছিল, আর মাটির ডাস্টবিনের প্রেমে জীবন উৎসর্গ করে তাকে শাদা জামা পরিয়ে দিচ্ছিল।"[১২]

পক্ষান্তরে বাংলার জল, বাংলার মাটির অকুণ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে প্রকৃতি প্রাণ পায়। নির্মলতা ও পেলবতায় গল্পের আবহ হয়ে ওঠে মনোহর। তেমনই আবহ নিয়ে মেঘ ও রৌদ্র গল্পের প্রস্তাবনা করছেন এভাবে -

> "পূর্বদিন বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকাল ম্লান রৌদ্র ও খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউশ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তৃত শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।"[১৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, মহাদেশ একটি হলেও ভৌগলিক সীমারেখার জন্য প্রকৃতির অবস্থান ভিন্ন। তাই নৈসর্গিক রূপ ভিন্নতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনায় উভয়ের ছোটগল্পের জমিনকে বহুবর্ণিল করেছে।

শিশুমন কাদামাটির মতো। আবার স্বচ্ছ জলের ঝর্ণার মতোও। কাদামাটি এজন্য যে এটিকে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে গড়িয়ে নেয়া যায়। আবার স্বচ্ছ জলের ঝর্ণার মতো এজন্য যে এখানে নেই কোনও পঙ্কিলতার ছাপ। এই নিষ্কলুষ মনে অল্পকিছুতেই খুশির ফোয়ারা ফোঁটানো যায়। যায় তাদেরকে কল্পনার ডানায় ভর করিয়ে পরিস্তানে ঘুরিয়ে আনা। তাদেরকে যদি পাঠের টেবিলে বসানো যায় তাহলে তারা নিবিষ্ট পাঠক হয়ে যেমনি আনন্দ পাবে তেমনি পাবে কৌতূহলী মনের স্ফুরণ। এ স্ফুরণের দ্বারাই তারা নিজের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার উপাদান পাবে। সাথে নিজেকে সৎ ও সাহসী করে গড়ে তুলবে। তাই তাদেরকে আদর ও যত্নে রাখতে হবে। তারা যেনো ভুলে বা রাগে বিপথে পা না বাড়ায়। এজন্যই সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আগলিয়ে রাখার দায়িত্বই আমাদের বড়দের উপর। এমনি বড়দের ও ছোটদের শিক্ষামূলক একটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, শিশুরা দুষ্টু। তাই তাদেরকে শাসনের জোড়ে শোধরাতে চাইলে হিতে বিপরীত ঘটবে। যেমন ইঁদুরের ভোজ গল্পে স্কুলের ছেলেরা নতুন পণ্ডিতের কাছে কিছুতেই পড়বেন না। অথচ সেই পণ্ডিতই তাদেরকে এমন নাটকীয় আচরণে আদর করলেন যে, তারা অচেনা অবস্থায় কালীকুমার তর্কালঙ্কার মহাশয়কে তাদের স্কুলে কাজ নিতে জোরাজুরি করলো। গল্পটি রম্য হলেও শিশুদের শেখার উপযোগী ও নিটোল।

পক্ষান্তরে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ও আবহে লালিত জামালযাদেহ তাঁর মাত্র বারো বছর কাটানো ইরানের অমোচনীয় স্মৃতিকে নিয়েই কাটিয়ে দিয়েছেন সারাজীবন। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু ও ভাষা সব ইরানী। শিশুদের জন্য বিশেষ করে গল্পগ্রন্থ লিখেছেন তিনি। কেচ্চেহয়ি কুতাহ বারায়ে বাচ্চেহয়ি রিশদার শীর্ষক গল্পগ্রন্থে বারোটি শিশুতোষ ছোটগল্প

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 278 - 288
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রচনা করে তিনি শিশুদের মনের কথা বুনেছেন। যেমন নান ও দানদান নামক গল্পে একজন শিক্ষকের মৃত্যুর কথা শৈশব-কৈশোরকালীন কোমল মনে কতটা দাগ কাটে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

উপসংহার : বাংলা ও ফারসি ভাষার শ্রেষ্ঠ পরিশ্রমী লেখক হিসেবে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ তাঁদের ছোটগল্পে প্রকৃতি, নিসর্গ, স্বাজাত্যবোধ, সমকালীন প্রেক্ষাপট, প্রেমিকের সাতকাহন, গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের রূপায়ণ, ভূগোল ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও উপজাতি ইত্যাদি বিষয় বা ভাব সুনিপুণ চিত্রকরের মতো এঁকেছেন। যেগুলো প্রায়ই কাছাকাছি। পাশাপাশি তাঁদের শব্দ ব্যবহার, উপমা-উৎপ্রেক্ষার বুনন, বর্ণনা রীতি, নির্মাণ কৌশল, চমৎকারিত্ব ইত্যাদি অনেকাংশেই মিলে যায়। উভয়ের প্রকাশ পদ্ধতিতে এনকটাই সাদৃশ্য আছে। তবে রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে তাঁর ভাষার একধরনের মাধুর্য। আর বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে জামালযাদেহ অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন।

Reference:

১. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, রাজুলে সিয়াসি, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৬০
২. বিশী, প্রমথ নাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৩৬৪, পৃ. ৪৫
৩. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দোস্তিয়ে খালে খারসেহ, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৭২
৪. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৬৯
৫. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দারদে দেলে মোল্লা কোরবান আলী, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৭১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৭৩
৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ৬৮
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৭৩
৯. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দারদে দেলে মোল্লা কোরবান আলী, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৯২
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৭
১১. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, ফারসি শেকার আসত, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ০৫
১২. জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, দোস্তিয়ে খালে খারসেহ, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল/ খ্রি. ২০০০, পৃ. ৮০
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৯৭

Bibliography:

জামালযাদেহ, সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী: রাজুলে সিয়াসি, *ইয়াকি বুদ ইয়কি নাবুদ,* (ইরান, কেতাবখনেয়ে মিল্লিয়ে ইরান, ১৩৭৯ ফারসি সাল)
বিশী, প্রমথ নাথ, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প,* কলকাতা, দে'জ পাবলিকেশন্স, ১৩৬৪
ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ২০০২
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ,* ঢাকা, দি স্কাই পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১৩
রফিক, আহমদ, *রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংস্কৃতি,* ঢাকা, অনিন্দ্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০২০
হাসেমী, ড. সাইয়েদ মোহাম্মদ রেজা, *একদা এক সময়,* ইরান, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮

রহমান, বদিউর, *রবীন্দ্র জীবনের আশি বছর,* ঢাকা: কথা প্রকাশ, একুশে বইমেলা, ২০১২

মাওলা, ড. আহমেদ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,* ঢাকা: ভাষা প্রকাশ, ২০১৯

হায়দার, মুহম্মদ, *রবীন্দ্রনাথ: তিনটি গল্প,* ঢাকা: মূর্ধণ্য, ডিসেম্বর, ২০২১

হাকিমি, ইসমাইল, আদাবিয়াতে মোআসেরে ইরান, তেহরান: আসাতির প্রেস, ২০১৯

শারহে হলে অহ্বায়ে জামালয়াদেহ ব গুলামে খোদ বে গুলামে সাইয়েদ হাসান তাক্বিযাদেহ, তাবরিজ: নাশরে দানেশকাদেয়ে আদাবিয়াতে তাবরিজ, ১৯৫৪